Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার মিতু

রোলঃ 228021604

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার মিতু

রোলঃ 228021604

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার মিতু, আইডিঃ 228021604 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শারমিন আক্তার মিতু

\- ______________________________

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

শারমিন আক্তার মিতু

আইডিঃ 228021604

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা 9

১.১:খৃষ্টানরা মুসলমানদের বন্ধু নয় 9

১.২ ঈসা (আ:)পুনরায় পৃথিবীতে এসে যা বলবেন 11

১.৩ শুধু ইহূদী-খ্রিষ্টান নয়, বরং কাফিরদের সাথেও বন্ধুত্ব গড়া নিষিদ্ধ 13

অধ্যায় ২: ইহূদী- খ্রিষ্টান 13

২.১ ইহূদী-খ্রিষ্টান পরিচিতি : 13

২.২ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ইতিহাস চির কপটতার ইতিহাস 14

২.৩ বিভিন্ন ফিরকাসমূহ: 18

অধ্যায় ৩:খ্রিষ্টাধর্ম প্রচারক 19

৩.১ ড উইলিয়ম কেরী: 20

৩.২ মাদার তেরেসা: 20

৩.৩ ফাদার এনজো কর্বা 20

৩.৪ ফাদার কার্লো কালাঙ্কি 21

৩.৫ ফাদার রিনাল্ডো নাভা: 22

অধ্যায় ৪: খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের ইতিহাস (বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত) 22

৪.১ ইউরোপে মিশনারি আন্দোলনের সূত্রপাত: 22

৪.২ উপনিবেশবাদের সাথে সম্পর্ক: 23

৪.৩ ধর্ম প্রচারে ব্যবহৃত কৌশল: 24

অধ্যায় ৫: উপমহাদেশে মিশনারিদের আগমন ও কার্যক্রম 25

৫.১ ধর্মীয় ও ভাষাগত প্রভাব: 25

৫.২ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি: 25

৫.৩ ব্রিটিশ রাজের মদদে মিশনারিদের কার্যক্রম: 26

অধ্যায় ৬: বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন: ঐতিহাসিক পটভূমি: 26

৬.১ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে কার্যক্রম: 27

৬.২ ১৯৭১ পরবর্তী সুযোগ: 27

৬.৩ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: 28

অধ্যায় ৭: মিশনারিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কৌশল : 28

৭.১ সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা: 29

৭.২ স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে ধর্মান্তরের কৌশল: 29

৭.৩ অর্থনৈতিক চাহিদাকে হাতিয়ার বানিয়ে ঈমান নষ্টের চেষ্টা: 29

অধ্যায় ৮: শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রভাব: 30

৮.১খ্রিষ্টান মতাদর্শ প্রচারে শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার: 30

৮.২ খ্রিষ্টান বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার : 30

৮.৩ ধর্মীয় নিরপেক্ষতার নামে ইসলামী শিক্ষাকে বাদ দেওয়া: 30

অধ্যায় ৯: স্বাস্থ্যসেবার আড়ালে প্রচার কার্যক্রম 31

৯.১ হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র: 31

৯.২ গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় কৌশল: 31

৯.৩ চিকিৎসার বিনিময়ে ধর্মান্তর: 32

অধ্যায় ১০: এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগিতার মুখোশ: 32

১০.১ প্রধান এনজিওসমূহের নাম ও কার্যক্রম: 33

১০.২ বিদেশি অর্থায়নের উৎস: 33

১০.৩ "উন্নয়ন" শব্দের অপব্যবহার: 34

অধ্যায় ১১: পাহাড়ি অঞ্চলে ধর্মান্তর কর্মকাণ্ড (CHT অঞ্চলের উপর বিশেষ আলোচনা):...35

১১.১ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে কার্যক্রম 35

১১.২ আদিবাসীদের মধ্যে প্রভাব: 36

১১.৩ সরকার ও সামরিক শক্তির অবস্থান: 36

অধ্যায় ১২: আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন: 37

১২.১ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা: সহজ লক্ষ্যবস্তু: 37

১২.২ ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা: প্রতিরোধহীনতা: 37

১২.৩ ভোটব্যাংক ও রাজনৈতিক স্বার্থ: কৌশলগত ব্যবহার: 37

অধ্যায় ১৩: ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর প্রভাব: 38

১৩.১ ইসলামী আচার-আচরণে পরিবর্তন: 38

১৩.২ মুসলিম তরুণদের লক্ষ্যবস্তু করা: 38

১৩.৩ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: 39

অধ্যায় ১৪: মুসলিম সমাজে ধর্মান্তরের চেষ্টার ধারা: 40

১৪.১ আর্থিক লোভ দেখানো: 40

১৪.২ বেকার যুবকদের চাকরির প্রলোভন: 40

১৪.৩ ধর্মীয় অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ: 41

১৪.৪ নারীদের টার্গেটকরণ ও পরিবার-ভিত্তিক কৌশল: 42

অধ্যায় ১৫: মিশনারি কার্যক্রম ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা: 44

১৫.১ সামাজিক সহিংসতা ও বিভাজন: 44

১৫.২ কৌশলগত ধর্মান্তর: 45

১৫.৩ সংখ্যালঘু রাজনীতি: 45

অধ্যায় ১৬: আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার ভূমিকা ও প্রভাব 45

১৬.১ ইইউ, ইউএসএআইডি ও বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা: 46

১৬.২ ‘সুশীল সমাজ’ এর ব্যবহৃত মুখোশ: 46

১৬.৩ বৈদেশিক চাপে সরকার: 47

অধ্যায় ১৭: খ্রিস্টান বানানোর কৌশল 48

১৭.১ দান ও দয়ালু কার্যকলাপের মাধ্যমে মন জয় করা: 48

১৭.২ দারিদ্র্য ও দুর্যোগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার: 49

১৭.৩ ইসলামী জ্ঞানের অভাবকে কাজে লাগানো: 49

অধ্যায় ১৮: যে অঞ্চলে অপতৎপরতা বেশি..50

১৮.১. দিনাজপুর জেলা..50

১৮.২. পঞ্চগড় জেলা..51

১৮.৩. ঠাকুরগাঁও জেলা..52

অধ্যায় ১৯: বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ও পদক্ষেপ..52

১৯.১ সংবিধানে ধর্মীয় অধিকার:..52

১৯.২ এনজিও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা:..53

১৯.৩ রাষ্ট্রীয় নজরদারি:..54

অধ্যায় ২০: উপসংহার..54

অধ্যায় ১: ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আধুনিক বিশ্বের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে অন্যতম একটি বড় বিষয় হলো ধর্মান্তরকরণ তথা মিশনারি তৎপরতা। খ্রিস্টান মিশনারিরা বহু শতাব্দী ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে দরিদ্র, পশ্চাৎপদ ও মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে ধর্মান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এই তৎপরতা শুধু ধর্মীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সাথে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মুসলিম সমাজে খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মকাণ্ড একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। ইসলামের ভিত্তি হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য। কিন্তু মিশনারিরা ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

ইসলাম ধর্ম সহনশীলতার শিক্ষা দেয় এবং দাওয়াতের মাধ্যমে অমুসলিমদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে বলে।

আর হাদীসে এসেছে:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছাও, ولو একটি আয়াতও হয়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৬১)

এই থিসিসে আমরা খ্রিস্টান মিশনারিদের ইতিহাস, তাদের কার্যক্রমের ধরন, মুসলিম সমাজে তার প্রভাব, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের অবস্থান এবং মুসলিম উম্মাহর করণীয় বিষয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১.১:খৃষ্টানরা মুসলমানদের বন্ধু নয়

ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষার একটি অংশ হলো, মুসলমানদেরকে সব সম্পর্ক ও মিত্রতার ক্ষেত্রে তাদের ঈমান ও আকীদার প্রতি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ

তাআলা কিছু স্পষ্ট নিদর্শনের মাধ্যমে কাফের ও মুশরিকদের সঙ্গে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। খ্রিষ্টানরাও যেহেতু মুসলমানদের মতো একত্ববাদে বিশ্বাস না রেখে 'ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র' বলে থাকেন, তাই কুরআনের দৃষ্টিতে তারা 'আহলে কিতাব' হলেও 'বন্ধু' বা অন্তরঙ্গ মিত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

حيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু (অন্তরঙ্গ সহচর) হিসাবে গ্রহণ করো না; তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে নিঃসন্দেহে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।"
(সূরা আল-মায়েদা: ৫১)

এই আয়াতে "أولياء" শব্দটি এসেছে, যার অর্থ "অন্তরঙ্গ বন্ধু", "সহায়ক" বা "অভিভাবক"। এটি কেবল সাধারণ সৌহার্দ্য বা সহানুভূতির কথা নয়, বরং গভীর আস্থার সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে — যেটা ঈমানদারদের জন্য নিষেধ।

কুরআন অবতরণের পরে তাওরাত-ইঞ্জীল মানসূখ হয়ে গেছে। এসবের কোন হুকুম এখন আর কারু জন্য পালনযোগ্য নয়। মূল তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। পুরাতন ও নতুন সমাচার (Old & New Testament) বলে প্রচলিত বই সমূহ তাদের নিজেদের রচিত। বিশ্ব মানবতাকে তাই এখন কেবলমাত্র কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলতে হবে। ইমাম শাওকানী বলেন, 'ইহূদী-নাছারাদের শরী'আত এখন মানসূখ বা হুকুম রহিত। তাদের কিতাব সমূহ পরিবর্তিত হয়ে গেছে'। এখন তাদের কিতাবের অনুসরণ করা অর্থ তাদের খোশখেয়াল সমূহের অনুসরণ করা'। তিনি বলেন, 'এই আয়াতগুলির মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য হুঁশিয়ারী ও সাবধানবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ইহূদী-নাছারা বা কোন মুশরিক ও বিদ'আতী দলসমূহের পাতা ফাঁদে পা না দেয় বা তাদের সন্তুষ্টি ও সমর্থন কামনা না করে।

তারা যেন কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানসমূহ ছেড়ে এইসব দলের চোখ ধাঁধানো ও দুষ্ট মতবাদ সমূহের পিছনে না ছোটে’ (শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর)।

সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন, অত্র আয়াতে ‘আহলুল কিতাব’ না বলে ‘ইয়াহূদ’ ও ‘নাছারা’ বলার তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুমিন সম্প্রদায়ের সাথে তাদের শত্রুতা মূলতঃ কিতাবের কারণে ছিল না। কেননা তাদের কিতাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে বলেনি। বরং তাদের এই দুশমনী ছিল স্রেফ রাজনৈতিক ও দলীয় হিংসার কারণে। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসলমানকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে ইহূদী-নাছারাকে তাদের আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এটা করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের দলের বাইরে চলে যাবে। আল্লাহ ও রাসূল তাদের থেকে মুক্ত’।[5]

১.২ ঈসা (আ:)পুনরায় পৃথিবীতে এসে যা বলবেন

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় পুনরায় আগমন করবেন। এটি কুরআন এবং বহু সহিহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি বিশুদ্ধ আক্বীদা। তাঁর এই আগমন কোনো নতুন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়; বরং তিনি আসবেন পূর্ববর্তী ভুল ধারণার সংশোধন এবং সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য।

ঈসা (আঃ) খ্রিস্টানদের ভুল বিশ্বাসের প্রতিবাদ জানাবেন

খ্রিস্টান ধর্মে হযরত ঈসা (আঃ)-কে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। অথচ তিনি কখনো নিজেকে উপাস্য বলেননি, বরং আল্লাহর একজন প্রেরিত রাসূল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে বলেন:

> وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ...

“আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়ম–পুত্র ঈসা! তুমি কি মানুষদের বলেছিলে, ‘আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ করো?’ তিনি বলবেন, ‘আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয় যা বলা আমার জন্য সঠিক নয়।’”
— সূরা আল-মায়িদা: **১১৬**

এই আয়াত অনুসারে, কিয়ামতের দিন ঈসা (আঃ) স্পষ্ট করে বলবেন তিনি কখনো নিজেকে উপাস্য হিসেবে দাবী করেননি। তিনি কেবল বলেছিলেন:

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু।"

হাদীসসমূহে এসেছে ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন, শির্ক ও কুফরের অবসান ঘটাবেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন এবং নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন:

১. দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

২. ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন।

৩. শূকর হত্যা করবেন।

৪. জিযিয়া বাতিল করবেন।

৫. ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিচার করবেন।

৬. মানবতাকে বলবেন "মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়ত মানো"।

সহীহ বুখারীর আরেকটি হাদীস:

" يَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ"...

"তিনি ক্রুশ ভেঙে দেবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া (কর) তুলে দেবেন..."
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৪৮)

এছাড়া তিনি মানুষকে আহ্বান করবেন:একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে,মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হিসেবে চলতে।শান্তি, ইনসাফ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায়।

১.৩ শুধু ইহূদী-খ্রিষ্টান নয়, বরং কাফিরদের সাথেও বন্ধুত্ব গড়া নিষিদ্ধ

শুধু ইহূদী-খৃষ্টান নয়, বরং কোন কাফেরের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে নিষেধ করে বলা হচ্ছে, لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর' (আলে ইমরান ৩/২৮)। দুনিয়াবী সম্মান লাভের জন্য যাতে এটা না করা হয়, সেজন্য বলা হয়েছে, الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا 'যারা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান কামনা করে? জেনে রেখো সর্বপ্রকার ইযযতের মালিকানা স্রেফ আল্লাহর' (নিসা ৪/১৩৯)। এমনকি নিজের বাপ-ভাই যদি ঈমানের উপরে কুফরীকে ভালবাসে, তবে তাদেরকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না (তওবাহ ৯/২৩)। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ করে কোন মুসলিম দেশের জাতীয় ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্র আয়াতগুলি স্থায়ী মূলনীতি স্বরূপ।

অধ্যায় ২: ইহূদী- খ্রিষ্টান

২.১ ইহূদী-খ্রিষ্টান পরিচিতি :

হযরত ইবরাহীমের প্রথমা স্ত্রী সারার গর্ভে ইসহাক্ব-এর জন্ম হয়। তাঁর বংশধরগণ 'বনু ইসরাঈল' নামে পরিচিত। এই বংশে হাযার হাযার নবীর জন্ম হয়। এদের ক্বিবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস। আহলে কিতাবদের মধ্যে এই দলই বড়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নবী হলেন মূসা (আঃ)। তাঁর নিকটে 'তাওরাত' নাযিল হয়। যা ছিল মূলতঃ হালাল-হারাম ইত্যাদি ব্যবহারিক বিধি-বিধান সম্বলিত গ্রন্থ। তাঁর অনুসারীগণ 'ইয়াহূদ' নামে পরিচিত। তারপরে শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন ঈসা (আঃ)। ইনি হযরত দাঊদ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর নিকটে 'ইঞ্জীল' নাযিল হয়। এটি ছিল মূলতঃ পরকালীন মুক্তির সুসংবাদবাহী ও উপদেশমূলক গ্রন্থ। তাঁর অনুসারীগণ 'নাছারা নামে খ্যাত। এঁদের ক্বিবলা ছিল কা'বাগৃহ। ইহূদীদের প্রতিপক্ষ ছিল ফেরাঊন, হামান প্রমুখ কাফের নেতাগণ এবং নাছারাদের প্রতিপক্ষ ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিকগণ। ইঞ্জীলে যেহেতু তাওরাতের বিধি-বিধানের তেমন কোন পরিবর্তিত ছিল না, সেকারণ তারা ঈসা (আঃ)-কে মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হিসাবে গণ্য করত। যদিও তারা

নিজেরা তাওরাতের বিধি-বিধান সমূহকে পরিবর্তন করেছে। যেমন শনিবারের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনকে রবিবার করা, শূকরের গোশতকে হালাল করা ইত্যাদি। তবে একটি বিষয়ে উভয় দল একমত ছিল যে, শেষ নবী মুহাম্মাদ সত্ত্বর আগমন করবেন এবং তাঁর নাম, চেহারা, জন্মস্থান সবই তারা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে জানত। সেকারণ তাদের পূর্ব পুরুষগণ শেষনবীকে সাহায্য করার জন্য সিরিয়া থেকে হিজরত করে মদীনার নিকটবর্তী এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন ও বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু যখন শেষ নবীর আবির্ভাব হ’ল এবং তিনি হিজরত করে মদীনায় এলেন,তখন তারা তাঁকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারলেও বংশীয় অহমিকা মাথাচাড়া দেওয়ায় তাঁকে সহযোগিতা দূরে থাক, বরং সবরকমের শত্রুতায় লিপ্ত হ’ল। উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদ-নাছারাগণ পরস্পরের শত্রু ছিল এবং প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষ দলকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবী করত (বাক্বারাহ ২/১১৩)। শেষ নবী এসে তাদেরকে বললেন, لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيل ‘তোমরা কিছুর উপরে নেই, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে প্রতিষ্ঠিত করবে’ (মায়েদাহ ৬৮)। যেহেতু তাওরাত ও ইঞ্জীল মানতে গেলে কুরআনকে মানতে বাধ্য হতে হয়, তাই তারা সবকিছুকে অস্বীকার করল ও শেষ নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হ’ল।[16]

২.২ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ইতিহাস চির কপটতার ইতিহাস

কুরআনের ভাষ্য:

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করার পর তা বুঝেও তা বিকৃত করে দেয়।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:৭৫)

তাফসীর ও বিশ্লেষণ:

ইহুদী বংশধররা অহংকার, কপটতা ও দ্বিমুখী আচরণের মাধ্যমে নবীদের হত্যা করেছে, সত্য গোপন করেছে এবং কিতাব বিকৃত করেছে।

(১) রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র : হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বনু নাযীর, বনু কুরায়যা প্রমুখ ইহূদী-নাছারা গোত্রসমূহের সাথে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা ইতিহাসে ‘মদীনার সনদ’ নামে পরিচিত। উক্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কেউ কারু বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। বরং পরস্পরে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুনাফিকের প্ররোচনায় ও কাফিরদের আহবানে তাদের গোত্রে দ্বীন প্রচারের

জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৭০ জনের একটি প্রচারকদল পাঠালে তারা সকলেই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের শিকার হন। ইতিহাসে যা বি'রে মা'ঊনার ঘটনা বলে প্রসিদ্ধ। উক্ত হত্যাকান্ড থেকে বেঁচে যাওয়া মাত্র একজন ছাহাবী আমর বিন উমাইয়া যামীরী মদীনায় ফেরার পথে শত্রুপক্ষীয় দু'জন কাফেরকে পেয়ে হত্যা করে ফেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দু'জন ছিল বনু আমের গোত্রের লোক, যাদের সঙ্গে রাসূলুললাহ (ছাঃ)-এর শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু সেকথা উক্ত ছাহাবী জানতেন না। তাদের সাথে বনু নাযীরেরও শান্তিচুক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ দুই নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য আদায়ের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার পরে মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে বনু নাযীর ইহূদী গোত্রে গমন করেন। হযরত আবুবকর, ওমর, আলী প্রমুখ ছাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। বনু নাযীর গোত্র তাঁদেরকে সসম্মানে একটি প্রাচীরের ছায়ায় বসতে দিল এবং গোত্রের লোকদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে এনে তাঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে দুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠল এবং এই সুযোগে রাসূলকে হত্যা করার ফন্দি অাঁটলো এবং বললঃ কে আছ এই লোকটিকে হত্যা করে এর হাত থেকে আমাদের শান্তি দিতে পার? তখন আমর বিন জাহহাশ বিন কা'ব নামক জনৈক ইহূদী সঙ্গে সঙ্গে রাযী হয়ে গেল এবং বড় একটি পাথর তাঁদের উপরে ফেলে মারার জন্য প্রাচীরের উপরে উঠে গেল। অহি-র মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন এবং চুক্তিভঙ্গের অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অবশ্য তিনি তাদেরকে অস্ত্র ব্যতীত কেবল এক উট বোঝাই মাল-সামান নিয়ে তাদের ইচ্ছামত স্থানে চলে যাবার জন্য ১০ দিনের সুযোগ দিলেন। কিন্তু মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীদের প্ররোচনায় তারা তাদের মযবূত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়। কিন্তু পরিশেষে মুনাফিকদের নিকট থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ায় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ায় তারা ২১ দিন পরে দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে এবং রাসূলের নির্দেশ মতে তারা أرض الحشر অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন মানুষের জমা হওয়ার স্থান শাম দেশ (সিরিয়া) অভিমুখে চলে যায়। হুয়াই বিন আখত্বাব, আব্দুল্লাহ বিন আবিল হুক্বাইক্ব, কিনানা বিন রাবী' প্রমুখ ইহূদী নেতৃবৃন্দ ও তাদের সাথীরা খায়বারে বসতি স্থাপন করেন। কেউ কেউ শামের অন্যস্থানে চলে যায়। ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন যে, এই ঘটনা ওহোদ যুদ্ধের পরে ৪র্থ হিজরীতে এবং বি'রে মা'ঊনার মর্মান্তিক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়। কুরতুবী এ মত সমর্থন করেন। তবে বুখারী যুহরীর মাধ্যমে ওরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনা ২য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে এবং ওহোদে পূর্বে সংঘটিত হয়'।[6] মদীনা তথা আরব উপদ্বীপ থেকে তাদের এই উচ্ছেদ ঘটনাকে কুরআনে أول الحشر বা 'প্রথম একত্রিত উচ্ছেদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[7]

তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে খায়বরে এটা ছিল প্রথম উচ্ছেদ। দ্বিতীয় উচ্ছেদ ঘটে ওমর ফারূকের সময়ে তাদের কুফরী ও ওয়াদা ভঙ্গের কারণে খায়বর থেকে নাজদ ও আযরি‘আতে। কেউ কেউ বলেন, যেরুযালেমের আরীহা ও তাইমাতে’।[৪] মূলতঃ হারূণ (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত এই গোত্র সিরিয়া থেকে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল শেষনবীর আগমনের আশায়। কিন্তু শেষনবী বনু ইসরাঈল না হয়ে বনু ইসমাঈল হওয়ায় তারা তাঁকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করে স্রেফ বংশীয় অহংকারের যিদে পড়ে (ঐ)।

(২) চুক্তি ভঙ্গ : মদীনার বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা প্রভৃতি ইহূদী-নাছারা গোত্রগুলি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কৃত চুক্তির প্রতি অনুগত ছিল। বরং বদর যুদেধ অভাবিত বিজয় লাভের ফলে তাদের মধ্যে রাসূলেল প্রতি আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ওহোদ যুদ্ধ বিপর্যয়ের ফলে ও মুশরিকদের অব্যাহত প্ররোচনার ফলে তাদের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গের প্রবণতা দানা বেঁধে ওঠে এবং তাদের অন্যতম নেতা কা‘ব বিন আশরাফ ৪০ জন ইহূদীকে সাথে নিয়ে গোপনে মক্কায় চলে যায় ও সেখানে কুরায়েশ নেতাদের নিয়ে কা‘বা গৃহের গেলাফ স্পর্শ করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।[9]

(৩) শত্রুর সহযোগিতা : ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যা গোত্র মদীনা আক্রমণকারী কাফের দলসমূহের সাথে সহযোগিতা করে। ফলে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হয় ও বাকীদের বন্দী করা হয় ও মাল-সম্পদ সবকিছু মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়।[10]

ইহূদী-খৃষ্টানদের এই মুসলিম বিদ্বেষের ইতিহাস রাসূলের যুগ থেকে এ যাবত জারি আছে। যদিও সে যুগে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মত সরলপ্রাণ খৃষ্টান নরপতি ছিলেন। যিনি শুধু মুসলমানদের সাহায্য করেননি; বরং গোপনে ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অমনিভাবে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও বহু ইহূদী-খৃষ্টান রয়েছেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি সহানুভূতিশীল সে যুগেও ছিলেন, এ যুগেও আছেন। বনু নাযীরকে যখন মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তখনও তাদের মধ্যকার দু’জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নিরাপদে মদীনায় থেকে যান। আজও যখন ফিলিস্তীনের অসহায় মুসলমান নর-নারী ও শিশুদের উপরে আমেরিকা ও বৃটেনের সহায়তায় বর্বর ইহূদী শাসকরা নির্মম হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তখনও সেখানে বহু শান্তিপ্রিয় ইহূদী আরব এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে

তীব্র প্রতবিাদ মিছিল করে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে ও পেন্টাগনে আত্মঘাতি বিমান হামলা চালানোর প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধবাজ বুশ প্রশাসন যখন ওসামা বিন লাদেনকে সন্দেহ করে ভূখা-নাঙ্গা আফগান জনগণের উপর ভয়ংকর হামলা পরিচালনার হুমকি দিচ্ছে এবং আমেরিকার সরকারী ও বিরোধীদল সর্বসম্মতিক্রমে এই হামলা পরিকল্পনা অনুমোদন করছে, তখনও দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক সিটিতে হাযার হাযার খৃষ্টান ছাত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে প্লাকার্ড বহন করে মিছিল করছে। এধরনের ব্যতিক্রম চিরকাল ছিল আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু সাধারণভাবে সকল ইহূদী-খৃষ্টান মুসলিম উম্মাহর শত্রু। বিশেষ করে ইহূদীরাই সবচেয়ে বড় শত্রু। ইবনু কাছীর বলেন, এর কারণ হ'ল এই যে, এদের ইসলাম বিদ্বেষ হ'ল হঠকারিতাসূলভ। এরা ইসলাম ও শেষ নবীকে হক জেনেই অস্বীকার করে কেবল বংশীয় অহংকার বশে। তারা বনী ইসরাঈলের বহু নবীকে হত্যা করেছে। অবশেষে আখেরী নবীকে কয়েকবার হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছে ও জাদু করেছে'। ইহূদীদের চাইতে নাছারাগণ মুসলমানদের কিছুটা নিকটবর্তী হবার কারণ এই যে, তারা নিজেদেরকে ঈসা (আঃ)-এর আনীত ইঞ্জীল কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে। তাছাড়া নাছরাদের মধ্যে বহু দুনিয়াত্যাগী সরলপ্রাণ ধর্মযাজক আছেন, যাদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে'।[11]

(৪) খাদ্যে বিষপ্রয়োগ : খায়বরের ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মেহমান হিসাবে দা'ওয়াত দিয়ে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে।[12]

(৫) চূলে জাদু : মুনাফিক লাবীদ বিন আ'ছাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চূলে জাদু করে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা করে।[13]

(৬) ক্রুসেড ঘোষণা : ১০৯৮-১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে খৃষ্টান-মুসলিম সদ্ভাব দূর হয়ে যায়। অবশেষে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর হাতে গোটা ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তি চরমভাবে মার খায়। এই পরাজয়ের গ্লানি তারা কখনো ভুলেনি। তাই ১ম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে যখন যেরুযালেম মুসলমানদের হাত থেকে বৃটিশ খৃষ্টানদের হাতে চলে যায়, সেদিন যেরুযালেমের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বৃটিশ জেনারেল এলেনবাই বলেছিল "Today ends the crusade" 'আজকে ক্রুসেড শেষ হ'ল'। ১৯২০ সালে ফরাসী জেনারেল গুরিয়ান একইভাবে সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কবরে পা রেখে বলে ওঠেন, "We have come back Saladin" 'ছালাহুদ্দীন আমরা আবার ফিরে এসেছি'।

(৭) অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা: রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহূদীদেরকে খৃষ্টানরাই ফিলিস্তীনে জোরপূর্বক বসতি স্থাপনে বাধ্য করে এবং তাদেরকে সামনে রেখে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তারিখে অবৈধ 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে এ যাবত তাদেরকে দিয়েই দৈনিক মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

হাদীস:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
"ইহুদীরা ৭২টি দলে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেক দলই জাহান্নামে যাবে।"
(তিরমিযি, হাদীস: ২৬৪০)

২.৩ বিভিন্ন ফিরকাসমূহ:

ইয়াহূদ-নাছারাগণ অসংখ্য দলে বিভক্ত। হাদীছে ৭২ ফেরকা বলা হলেও তার অর্থ হল অসংখ্য। যদিও মুসলমানদের সাথে শত্রুতার বেলায় তারা সবাই এক। আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে বনু ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় দল ইহূদীরা এখন বিশ্বের অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে এবং অপরের দয়ার ভিখারী হয়ে আমেরিকা ও ইসরাঈলে কোন রকমে টিকে আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী খৃষ্টানরা অহংকারে বুঁদ হয়ে আসন্ন ধ্বংসের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

আধুনিককালের খৃষ্টানরা প্রধানত: তিনভাগে বিভক্ত: ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্ট। এরা সবাই যীশু খৃষ্টের অনুসারী হওয়ার দাবীদার। খৃষ্টান ধর্ম কোন বিশ্বধর্ম ছিল না। কেননা শেষনবী ব্যতীত সকল নবীই ছিলেন গোত্রীয় নবী'।[17] ঈসা (আঃ) কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের আত্মশুদ্ধি ও পাপমুক্তির জন্য দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। এই ধর্মের কোন রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক রূপ ছিল না। ৩০৬ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনষ্টান্টাইন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'নিকিয়া' (Nicaea) অধিবেশনে রোমানদের মূর্তিপূজা ত্রিত্ববাদের আকারে এ ধর্মে ঢুকে পড়ে ও ত্রিত্ববাদের বুনিয়াদ স্বীকৃত হয়। ৫২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম গোটা রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোটা ইউরোপ এই ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। যদিও বহু খৃষ্টান এতে বিশ্বাসী নয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের অরচেষ্টার হলিক্রস কলেজের ধর্ম বিষয়ক বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ জন, এল, ইসপোসিটো বলেন, ...একমাত্র কুরআনই আসমানী কেতাব সমূহের মধ্যে অবিকৃত রয়েছে।

...বহু খৃষ্টানই আল্লাহর ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে না'।[18] সম্রাট কনষ্টান্টাইনের আমলেই ইউরোপকে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে ভাগ করা হয়। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনোপল বা আজকের ইস্তাম্বুল। এ অঞ্চলের ধর্মীয় প্রধানকে বলা হয়, 'পেত্রিয়ার্ক'। ইউরোপের বলকান রাজ্যগুলি, গ্রীস, মধ্য এশিয়া, মিসর ও আবিসিনিয়া হয় পশ্চিমাঞ্চল। যার রাজধানী হয় রোম এবং ধর্মীয় প্রধানকে বলা হয় 'পোপ'। শুরু হয় দু'অংশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিবাদ। চলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শত শত বছর ধরে। বর্তমানে বিশ্ব ক্যাথলিকদের প্রধান কেন্দ্র। পোপের কর্তৃত্ব ও মতবাদ অস্বীকার করেন পেত্রিয়ার্ক। তাই পোপ-পেত্রিয়ার্ক দ্বন্দ্ব খৃষ্টধর্মের আদিকাল থেকেই চলে আসছে।

১২৫৪ খৃষ্টাব্দে পেত্রিয়ার্ক মিখাইল কারোনারিউস-এর আমলে জন্ম নেয় গ্রীক 'অর্থোডক্স চার্চ'। যার প্রধান কেন্দ্র হয় কনস্টান্টিনোপল। সংস্কারক মার্টিন লুথার প্রথমে ছিলেন ক্যাথলিক ও স্বধর্মে সুপন্ডিত। পরে রোমান চার্চ ও পোপ-পাদ্রীদের অপকর্ম ও পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি যখন সংগ্রাম শুরু করেন, তখন পোপ জার্মান সম্রাটের সাহায্যে তার নাগরিকত্ব হরণের ব্যবস্থা করেন। লুথারের অনুসারীরা এই আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তীব্র প্রতিবাদ (Protest) জানায়। ফলে ১৫২৯ সালে জন্ম হয় 'প্রটেষ্ট্যান্ট' সম্প্রদায়ের। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী ও চতুর্থ এডওয়ার্ডের এই ধর্মমত গ্রহণ করায় প্রটেষ্ট্যান্ট মতবাদ ক্যাথলিক মতবাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে খৃষ্টানরা আরো বহু দলে বিভক্ত হয়। তাদের এক দল অন্য দলকে যথার্থ খৃষ্টান বলে বিশ্বাস করে না। ক্যাথলিক ধর্মমতে বিশ্বাসীর জন্য অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্টদের সাথে বিয়ে-শাদী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু মজার কথা হ'ল এই যে, দুনিয়ার সব জায়গায় অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে মুসলমানদের মুকাবিলায় এরা পরস্পরের সহযোগী।

অধ্যায় ৩:খ্রিষ্টাধর্ম প্রচারক

খ্রিস্টান মিশনারীর নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে । তাদের প্রশিক্ষিণে খ্রিস্টান নারীরা
(ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে । যাতে পরবর্তী জেনারেশনই তাদের টার্গেট । এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে । তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে সাধারণ নারীদেরকে নাজাতের কথা

বলে খ্রিস্টান বানাচ্ছে । দেশে তাদের অনেক নারী প্রচারক আছে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম কের মুসলমানদের খ্রিস্টান বানায় । মানুষের ঘরেঘরে যায় । খ্রিস্টধর্ম প্রচারের
জন্য যুবতীদেরকে কাজে লাগায় । অনেক সময় আবার টার্গেট করে ছেলেদেরকে প্রেমের টোপে ফেলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে ।

৩.১ ড উইলিয়ম কেরী:

তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রীধারী । তিনি পশ্চিমবাংলায় কৃষি কাজ করেছেন । তার ভাষা ইংরেজী,তিনি এদেশে এসে বাংলা ভাষা শিখেন । তিনি দেখলেন, বাংলা ভাষা কোনো সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ নয়। এটি ইংরেজী ভাষার সাথে মিলিয়ে একই ফর্মে একটি উন্নত ভাষা করা যায় । তিনি বহু বছর সাধনা করে এ বাংলাকে আধুনিক বাংলায় রুপান্তরিত করেন । বাংলা ভাষার উন্নতী সাধনে তার অবদান অনস্বীকার্য । তারপর তিনি কলিকাতায় সুপিরিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি নিজেই ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল হন । তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বাইবেল প্রচার । তখন বাংলা বর্ণনের কোনো ছাপাখানা ভারতবর্ষে ছিল না।তিনি ইংল্যান্ডে অর্ডার দিয়ে বাংলা বর্ণনের ছাপামিশিন নিয়ে আসেন এবংবাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপান । তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজী বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করেন ।ভারতবর্ষের মধ্যে বিলি করেন । এমন ত্যাগ যদি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে থাকতো তাহলে আমাদের এত দুর্দশায় পড়তে হোত না।

৩.২ মাদার তেরেসা:

তিনি অবিবাহিতা ছিলেন । বাংলাদেশ পশ্চিম বাংলায় তার প্রতিষ্ঠিত ৩০০ এতিমখানা রয়েছে। মাদার তেরেসার একবড় টার্গেট ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা ।

৩.৩ ফাদার এনজো কর্বা

তিনি যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন ২৮জুন ১৯৫৬ খ্রিঃ ইতালীতে ।
তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারের কাজ করেন । যেসব স্থানে কাজ করেছেন নিম্ন তার একটি তালিকা দেওয়া হলো । ১৯৫৮-১৯৬০
খ্রিঃ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁয়ের সদর থানার রুহিয়া গ্রামে খ্রিস্টান
ধর্ম প্রচার করেন । এই রুহিয়া হলো ঠাকুরগায়ের একটি দূর্গম গ্রাম । সেখানে তারা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন । এই অঞ্চলের আঞ্চলিক

ভাষা শিখে এসেছে । এর পর তিনি ১৯৬০-১৯৬২ খ্রিঃ পর্যন্ত বনপাড়ায়
খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন । ১৯৬২-১৯পর্যন্ত বেনিদুয়ার । ৬৪ খ্রিঃ বেনিদুয়ার থেকে চলে আসেন দিনাজপুর জেলার সুইহারীতে । ওখানে ধর্ম প্রচার করেন ১৯৬৫-১৯৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত । ১৯৭২-১৯৯১ খ্রিঃ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন বরিশালের গৌরনদীর
রাজপুরে । এরপর তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য পাড়ি জমান ফিলিপাইনে । ওখানে ১৯৯১-১৯৯৭ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় সাত বছর ধর্ম প্রচার করেন । এরপর আবার ফিরে আসেন বাংলাদেশে । এসে চলে যান দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার বটতলির পাশে সিংড়া বনে ওখানে ১৯৯৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ।

এই সিংরাবনে সাধরণত মানুষ খুব কম চলাফেরা করে । সেই বনেরভিতরে বিশাল গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছে । ওই এলাকার সাঁওতালদেরকে খ্রিস্টান বানিয়েছে। অনেক মুসলমানকেও খ্রিস্টান বানিয়েছে । স্থানীয় একজন আলেমের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম ওই গির্জার পাশে সেমিনার রুমে সাধারণ মানুষকে এনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । মাঝে মাঝে এলাকার সাধারন কোনো ইমাম বা হুজুর টাইপের কাওকে ডেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে,উত্তর দিতে না পারলে বলে দেখেছ, মুসলমানরা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি এবং মুসলমানরা হুজুরইসা আ এর প্রশংসা করেছে । এর দ্বারা বুঝা গেল খ্রিস্টধর্মই সত্য। এভাবে ওই এলাকার সাধারণ মানুষকে খ্রিস্টান বানিয়েছে। সর্বশেষ ২৯নভেম্বর ২০১২সালে সেই দূর্গম এলাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন । এখানেই তার কবর রচিত হয়েছে।

৩.৪ ফাদার কার্লো কালাঙ্কি

তিনি যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন ২৯জুন ১৯৫২ খ্রিঃ ইতালী ।

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ করেন । যেসব স্থান কাজ করেছে নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো । ১৯৫৮ - ১৯৬৭খ্রিঃ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার নিচপড়া এলাকায় ধর্ম প্রচার করেন । এরপর তিনি ১৯৬৮-১৯৬৯খ্রিঃ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন ।

১৯৬৯-১৯৭২ ইং সালে আবার চলে যান ইতালীর রোমে ।১৯৭২-১৯৭৭ খ্রিঃ পর্যন্ত আন্ধার কোটায় কাজ করেন । এর পর আবার চলে আসেন বাংলাদেশে ।

১৯৭৭-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন দিনাজপুর জেলায় । এভাবে ওই ভদ্রলোক মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য পুরো জীবন উৎসর্গ করেন । সর্বশেষ দিনাজপুর জেলায় ১২-০২-২০১৩ইং সে মারা যান ।

৩.৫ ফাদার রিনাল্ডো নাভা:

তিনি যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন-০৩ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিঃ ,(ইতালী)। ধর্ম প্রচারের কাজ করার জন্য বাংলাদেশে আসেন ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে । ধর্ম প্রচার করেন দেশের বিভিন্ন স্থানে । প্রায় পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন । এই কাজকর্মই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে ছিলেন । তার জন্ম হলো ইতালিতে । ৮-৬-১৯৫১ইতালিতে জন্ম গ্রহন করেন। ইতালিতে থাকেন নি পাড়ি জমালেন বাংলাদেশে । সর্বশেষ যশোর জেলায়০৪-০৭-২০১১ইং সনে মৃত্যুবরণ করেন ।

অধ্যায় ৪: খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের ইতিহাস (বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত)

খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রম একটি সুদীর্ঘ ও পরিকল্পিত ইতিহাসের অংশ, যা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের উদ্ভব, বিস্তার ও কৌশলগত রূপরেখা আলোচনা করব।

৪.১ ইউরোপে মিশনারি আন্দোলনের সূত্রপাত:

খ্রিষ্টান মিশনারি আন্দোলনের সূচনা ইউরোপীয় খ্রিষ্টধর্মের সম্প্রসারণ নীতির একটি অঙ্গ। এই আন্দোলনের শিকড় প্রোথিত রয়েছে প্রাথমিক খ্রিষ্টীয় যুগ থেকেই, যখন যীশু খ্রিষ্টের শিষ্যরা ধর্মপ্রচার শুরু করেন। খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচারের জন্য প্রথম যিনি সুসংগঠিত উদ্যোগ নেন, তিনি হলেন পল (Paul the Apostle)। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ধর্মপ্রচারে অংশ নেন এবং খ্রিষ্টধর্মকে একটি আন্তর্জাতিক ধর্মে রূপান্তরিত করার ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে সংগঠিত ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত মিশনারি আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা ঘটে মধ্যযুগে।

৫ম শতক থেকে শুরু করে মধ্যযুগে (৫ম-১৫শ শতক) ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী যেমন: ফ্রান্সিসকান, ডমিনিকান প্রভৃতি "মিশনারি আদেশ" গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন অ-খ্রিষ্টান অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে পাঠায়। এই সময় ক্রুসেডের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের ওপর সামরিক আক্রমণ চালিয়ে ধর্মীয় দিক থেকেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করা হয়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে রেনেসাঁ ও ভূখণ্ড আবিষ্কারের যুগে (১৫শ - ১৭শ শতক), যখন ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারকগণও নতুন ভূখণ্ডে পাড়ি জমান। এই সময়

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, ভাস্কো দা গামা ভারত পৌঁছান—এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মিশনারিরা বিশ্বের নানা প্রান্তে পৌঁছায়।

ঊনবিংশ শতকে এসে মিশনারি আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করে। তখন ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মগোষ্ঠীও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। লন্ডন মিশনারি সোসাইটি (১৭৯৫), ব্যাসেল মিশন (১৮১৫), আমেরিকান বোর্ড অব কমিশনারস ফর ফরেন মিশনস (১৮১০) প্রভৃতি সংস্থা গঠিত হয় এবং তারা আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচারে নামে। এই সময় মিশনারিদের কর্মকাণ্ড ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশের হাতিয়ারস্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মপ্রচারের আড়ালে ইউরোপীয় আধিপত্য বিস্তারের ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিল।

মিশনারিরা স্কুল, হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে স্থানীয় জনগণের মন জয় করতে চেষ্টা করলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়দের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ ও ধর্মযাজকের মধ্যে এক অলিখিত সমঝোতা ছিল যে, ধর্মপ্রচার ও উপনিবেশ স্থাপন একে অপরের পরিপূরক। ফলে মিশনারি আন্দোলন ধর্মীয় প্রেরণার পাশাপাশি ছিল এক বিস্তৃত রাজনৈতিক কৌশলের অংশ।

৪.২ উপনিবেশবাদের সাথে সম্পর্ক:

খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের সঙ্গে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। ইউরোপ যখন আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন সাথে সাথে খ্রিস্টান মিশনারিরাও এসব অঞ্চলে প্রবেশ করে। এটি অনেক ক্ষেত্রে ছিল কৌশলগত; সামরিক বা রাজনৈতিক দখলের আগে মিশনারিরা স্থানীয় জনগণের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করত, ধর্ম প্রচারের আড়ালে সাংস্কৃতিক ও মানসিক দাসত্ব কায়েম করত।

বিশেষ করে ব্রিটিশ, ফরাসি, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ উপনিবেশবাদীরা ধর্ম প্রচারকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। মিশনারিরা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পত্রিকা, বইপুস্তক এবং অনুবাদ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে পশ্চিমা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত।

৪.৩ ধর্ম প্রচারে ব্যবহৃত কৌশল:

খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্ম প্রচারে যে কৌশলগুলো ব্যবহার করেছে, তা অত্যন্ত সুনিপুণ এবং বহুস্তরবিশিষ্ট। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৌশলগুলো হলো:

1. দাতব্য কাজ ও অর্থনৈতিক সাহায্য: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা সরবরাহের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন এবং পরে ধর্মান্তরের পথে উদ্বুদ্ধ করা।

2. শিক্ষা ও ভাষার ব্যবহার: স্থানীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, খ্রিস্টান ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ছিল তাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের পন্থা।

3. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা: আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে মিশনারিরা স্থানীয় মানুষের দুর্দশায় পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বস্ততা অর্জন করত।

4. মানসিক প্রভাব ও সহানুভূতির ব্যবহার: যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মিশনারিরা সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এ সময় তারা মানুষের দুর্বলতা ও আবেগকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

5. নারী ও শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানানো: মিশনারিরা জানত যে পরিবারে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব রাখে, তাই তাদেরকেই প্রথমে সাহায্য, প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ দিয়ে ধর্মান্তরের দিকে ধাবিত করত।

অধ্যায় ৫: উপমহাদেশে মিশনারিদের আগমন ও কার্যক্রম

উপমহাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন একটি ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের দিকচিহ্ন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রায় সমান্তরালে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। উপমহাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্মীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের কার্যক্রম একটি সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদী ধর্মান্তর নীতির অংশ ছিল। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি তারা শিক্ষা, চিকিৎসা ও দাতব্য কাজের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

৫.১ ধর্মীয় ও ভাষাগত প্রভাব:

খ্রিস্টান মিশনারিরা শুধু ধর্ম প্রচারে সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা ভাষা ও সাহিত্যকেও ব্যবহার করেছে একটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে।

বাংলা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করে তারা স্থানীয় জনগণের কাছে ধর্মগ্রন্থ সহজলভ্য করে তোলে। উইলিয়াম কেরি কর্তৃক অনূদিত বাইবেল ও অন্যান্য খ্রিস্টান সাহিত্যে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের শব্দাবলি বাদ দিয়ে সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ চয়ন করা হয়, যাতে মুসলিম জনগণের ভাষা ও সাহিত্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায়।

তারা প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দাবলি বাদ দিয়ে শব্দভাণ্ডার সংস্কৃতমুখী করে তোলে। এর ফলে ভাষাগতভাবে মুসলমানদের প্রান্তিক করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

স্কুল ও কলেজে খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালু করে নতুন প্রজন্মকে পশ্চিমা চিন্তাভাবনায় শিক্ষিত করার পাঁয়তারা করা হয়।

৫.২ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি:

মিশনারিদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা ছিল মূল টার্গেট জনগোষ্ঠী। কারণ ইসলাম ছিল উপমহাদেশে একটি শক্তিশালী ও সাংগঠনিক ধর্মীয় শক্তি, যা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হতো।

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন, কুরআন ও হাদীসের প্রতি অনুরাগ এবং আলেম-উলামাদের নেতৃত্ব মিশনারিদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।

তারা মুসলমানদের "প্রতিবন্ধক গোষ্ঠী" মনে করে, প্রথমে হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মান্তরে মনোযোগ দেয়, পরে মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, প্রান্তিক ও অশিক্ষিত শ্রেণির মানুষের ওপর লক্ষ্য স্থির করে।

মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে মিশনারিরা নানা ধরনের অপপ্রচার চালায়। মুসলিম ধর্মগুরুরা এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে জবাব দিতে শুরু করেন। এ সময় মুনশী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ মুসলিম চিন্তাবিদদের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৫.৩ ব্রিটিশ রাজের মদদে মিশনারিদের কার্যক্রম:

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমদিকে ধর্মীয় কার্যক্রম থেকে নিজেদের দূরে রাখলেও, ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের পর মিশনারিদের ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর থেকে মিশনারিদের উপস্থিতি এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে যায়।

উইলিয়াম কেরি (William Carey) ছিলেন উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকারের মদদপুষ্ট অন্যতম প্রধান মিশনারি। তিনি ১৭৯৩ সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।

ব্রিটিশ প্রশাসন মিশনারিদের জন্য জমি বরাদ্দ, অর্থায়ন, ভ্রমণ সুবিধা এবং প্রভাবশালী অবস্থান নিশ্চিত করে। তাদের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং ছাপাখানার মাধ্যমে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়ানোর পথ সুগম হয়।

অধ্যায় ৬: বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন: ঐতিহাসিক পটভূমি:

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন ও কার্যক্রম একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ফল। উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূচনা থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিরা এখানে ধর্মীয়

ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্বে এই কার্যক্রম নানা রূপে বিস্তৃত হয় এবং রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাবেও ভিন্ন মাত্রা পায়।

৬.১ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে কার্যক্রম:

ব্রিটিশ আমলে খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মকাণ্ড সরকারিভাবে উৎসাহিত করা হতো। ইংরেজরা উপনিবেশকে দীর্ঘস্থায়ী করতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টান মিশনারিদের ব্যবহার করত।

১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরির আগমন ছিল এই ধারার সূচনালগ্ন। পরবর্তীতে ক্যালকাটা ও সেরামপুর ছিল মিশনারি কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু, যার প্রভাব পূর্ববঙ্গেও পড়ে।

মুসলমানদের শিক্ষাবিমুখতা ও দরিদ্রতা ব্যবহার করে মিশনারিরা শিক্ষা, চিকিৎসা ও ত্রাণকেন্দ্রের মাধ্যমে ধর্মান্তরণের কাজ চালিয়ে যায়।

পাকিস্তান আমলেও পূর্ব পাকিস্তানে মিশনারিদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। যদিও সংখ্যায় তারা ছিল কম, তথাপি পাহাড়ি অঞ্চল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারা কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মান্তরণ চলমান ছিল।

৬.২ ১৯৭১ পরবর্তী সুযোগ:

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্য যেমন স্বাধীনতার দ্বার খুলে দেয়, তেমনি খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্যও এক নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক এনজিও এবং খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা 'মানবিক সহায়তার' নামে প্রবেশ করে।

সেই সময় মানবিক বিপর্যয়, দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা কাজে লাগিয়ে তারা খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয়, শিক্ষা ও আর্থিক সহায়তার বিনিময়ে ধর্মান্তরণের পথ প্রশস্ত করে।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যেই আটটি নতুন মিশনারি সংস্থা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে, যেমন: World Vision, Caritas, CCDB ইত্যাদি।

এই সময়কালে সরকারের পক্ষ থেকেও বিদেশি সহায়তার প্রয়োজন থাকায় মিশনারি সংস্থাগুলোর উপর বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি, বরং বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হয়।

৬.৩ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। এই পরিবর্তন একদিকে ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি নিশ্চিত করলেও, মিশনারিদের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে না—কারণ তারা তখন 'উন্নয়ন সহযোগী' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সরকার মিশনারি এনজিওদের তৎপরতা সম্পর্কে শুরুতে সর্তক না হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিশনারিদের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে—বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তরণ নিয়ে।

বর্তমানে সরকারি নীতিতে এনজিও নিয়ন্ত্রণের নানা উদ্যোগ থাকলেও, খ্রিস্টান এনজিওরা তাদের আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং মানবিক সহায়তার মাধ্যমে প্রভাব বজায় রাখছে।

এই অধ্যায় থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টান মিশনারিরা কৌশলগতভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাষ্ট্রীয় শিথিলতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে।

অধ্যায় ৭: মিশনারিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কৌশল :

খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের সমাজ ও অর্থনীতির দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম বিস্তারে একাধিক কৌশল গ্রহণ করেছে। এই কৌশলগুলো সরাসরি ধর্মান্তরণ কিংবা ধর্মীয় অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়েছে, যা জাতীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐক্য ও নিরাপত্তার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭.১ সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা:

মিশনারিরা বহু সময় পরিকল্পিতভাবে সমাজের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং গোষ্ঠীগত বিভাজনকে উসকে দেয় বা ব্যবহার করে। তারা মুসলিম সমাজের মধ্যকার গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে তাদের মনে নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনধারা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে যারা শিক্ষা বা জীবিকা থেকে পিছিয়ে আছে, তাদের মাঝে হতাশা তৈরি করে ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ায়। এরপর তারা খ্রিষ্টধর্মকে "সমাধান" হিসেবে তুলে ধরে। ফলে, এই বিভক্তির মাধ্যমে তারা একটি প্রভাবিত শ্রেণি তৈরি করে, যারা পরে মিশনারিদের হাতিয়ার হয়ে কাজ করে। এই কৌশলের মাধ্যমে শুধু ধর্মান্তর নয়, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করে তারা।

৭.২ স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে ধর্মান্তরের কৌশল:

মিশনারিরা খুব কৌশলে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে খ্রিষ্টান ধর্মের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তারা বাইবেল ও ধর্মীয় সাহিত্যের অনুবাদ স্থানীয় ভাষায় করে এবং এসবকে জনপ্রিয় সংস্কৃতি, লোককাহিনি ও সামাজিক গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। আবার অনেক সময় খ্রিষ্টান ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো স্থানীয় প্রথার সঙ্গে মিলিয়ে সংস্কৃতির মতো করে চালু করে দেয়, যেন মানুষ তা বুঝে না উঠেই গ্রহণ করে ফেলে। এতে করে ধর্মীয় আদর্শের পরিবর্তন ঘটলেও মানুষ তা সহজে টের পায় না। দীর্ঘমেয়াদে এটি সমাজের ধর্মীয় চেতনায় এক গভীর প্রভাব ফেলে।

৭.৩ অর্থনৈতিক চাহিদাকে হাতিয়ার বানিয়ে ঈমান নষ্টের চেষ্টা:

অনেক দরিদ্র মুসলমান পরিবার যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য, শিক্ষা বা চিকিৎসার অভাবে কষ্টে থাকে, তখন মিশনারিরা ঠিক সেই দুর্বল মুহূর্তে তাদের সাহায্যের হাত বাড়ায়। কিন্তু এই সাহায্য নিছক মানবিকতার নামেও অনেক সময় শর্তসাপেক্ষ হয়। তারা অনেক সময় 'ধর্মান্তরিত হলে স্থায়ী সহায়তা পাওয়া যাবে' বা 'খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে উন্নত জীবনের সুযোগ মিলবে' এমন প্রচার চালায়। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চল, আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের মাঝে এই প্রলোভনমূলক কর্মকাণ্ড সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এটি একটি গভীর অর্থনৈতিক ফাঁদ, যা একদিকে দরিদ্র মানুষকে শিকারে পরিণত করে, অন্যদিকে সমাজের ধর্মীয় ভারসাম্য ধ্বংস করে।

অধ্যায় ৮: শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রভাব:

খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্ম প্রচারের জন্য শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও অঞ্চলসহস বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল কলেজ নির্মাণ করে তাতে ধর্ম প্রচার করছে।

৮.১খ্রিষ্টান মতাদর্শ প্রচারে শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার:

মিশনারিরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করে খ্রিষ্টান ধর্মের আদর্শ প্রচার করে। তারা এমন পাঠ্যক্রম তৈরি করে যেখানে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার আড়ালে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে তুলে ধরা হয়। অনেক সময় ইতিহাস, সাহিত্য বা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যবইয়ে খ্রিষ্টান ধর্মের মহিমা, যিশু খ্রিষ্টের ত্যাগ, চার্চের অবদান ইত্যাদি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হয়। মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তাদের নিজ ধর্মের প্রতি সন্দেহ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনার এটি একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি। বিশেষ করে যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু বা দুর্বল অবস্থানে রয়েছে, সেখানে এই প্রক্রিয়া আরও তীব্রভাবে প্রয়োগ করা হয়।

৮.২ খ্রিষ্টান বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার :

অনেক মিশনারি সংগঠন উন্নত অবকাঠামো ও শিক্ষার মান বজায় রেখে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণত আধুনিক, ইংরেজিমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদান করে থাকে। ফলে মুসলিম অভিভাবকরা নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সেসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে বাধ্য হন। কিন্তু ঐসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত খ্রিষ্টান প্রার্থনা, চার্চে অংশগ্রহণ, খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় উৎসব উদযাপন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোজগতে খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি তাদের বিশ্বাস ও পরিচয়ে দুর্বলতা সৃষ্টি করে, যা ইসলামী চেতনার জন্য বিপজ্জনক।

৮.৩ ধর্মীয় নিরপেক্ষতার নামে ইসলামী শিক্ষাকে বাদ দেওয়া:

মিশনারি নিয়ন্ত্রিত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “ধর্মীয় নিরপেক্ষতা” বা “সেক্যুলার এডুকেশন” এর নামে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান একেবারেই নেই, বরং অনেক জায়গায় ইসলামের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য বা নেতিবাচক ধারণা উপস্থাপন করা হয়। এতে করে মুসলিম ছাত্ররা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়, এমনকি নিজেদের ধর্মকে অন্য

ধর্মের তুলনায় পিছিয়ে মনে করতে শুরু করে। বিশেষ করে যারা গ্রামাঞ্চল বা দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলের শিক্ষার্থী, তারা মিশনারিদের দেওয়া শিক্ষা ও ধর্মীয় বয়ানকেই সত্য ধরে নেয়। একদিকে তারা আধুনিক শিক্ষা পাচ্ছে, অন্যদিকে নিজেদের ধর্মীয় শিকড় থেকে বিচ্যুত হচ্ছে—এটাই মিশনারিদের অন্যতম কৌশল।

অধ্যায় ৯: স্বাস্থ্যসেবার আড়ালে প্রচার কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং এটি মানবিক সহায়তার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলাদেশে তাদের ধর্ম প্রচার কার্যক্রমে এই সেবাকে একটি কার্যকর ও কৌশলগত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে।

৯.১ হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র:

বাংলাদেশে অনেক খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মেমোরিয়াল ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতাল (বান্দরবান), মিশনারি মেডিকেল সেন্টার (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), লালমোহন খ্রিস্টান ক্লিনিক (ভোলা) ইত্যাদি।

এই হাসপাতালগুলোতে সাধারণত গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং এখানেই শুরু হয় ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের কার্যক্রম। রোগীদের ও অভিভাবকদের মাঝে বাইবেল বিতরণ, প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়।

চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই ধর্মপ্রচারকও; তারা চিকিৎসার সময় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের নামে খ্রিস্টান মতবাদ উপস্থাপন করেন।

৯.২ গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় কৌশল:

শহর ও মফস্বল ছাড়িয়ে মিশনারিরা গ্রামীণ এলাকায় মোবাইল মেডিকেল টিম, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, টিকাদান কর্মসূচি ও মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।

গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া, প্রসূতি মায়েদের ও নবজাতকদের বিনামূল্যে ওষুধ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান—এসবের মাধ্যমে তারা সহজেই মানুষের আস্থা অর্জন করে এবং পরে ধর্মীয় আলাপ শুরু করে।

একাধিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এসব গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে ছোট বাইবেল, ধর্মীয় বই এবং প্রার্থনার বই দেওয়া হয়, যা তারা রোগীদের ও পরিবারকে উপহার হিসেবে দিয়ে থাকে।

৯.৩ চিকিৎসার বিনিময়ে ধর্মান্তর:

মানবিক দুর্বলতা ও চরম অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা চিকিৎসাকে ধর্মান্তরের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষত জটিল রোগে আক্রান্ত দরিদ্র রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার শর্ত হিসেবে ধর্মান্তরের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

চিকিৎসার সময় প্রার্থনা সেশন, খ্রিস্টান গানের পরিবেশন এবং খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে তারা রোগীদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করে তোলে।

কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে, চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পূর্বে ধর্মান্তরের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে নিরক্ষর রোগীদের ক্ষেত্রে।

অধ্যায় ১০: এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগিতার মুখোশ:

খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের বিস্তারে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হলো এনজিও (NGO) তথা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো। এই প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা—এসব মহৎ উদ্দেশ্যের মুখোশ পরিধান করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বাস্তবে অনেক এনজিওর মূল উদ্দেশ্য উন্নয়ন নয়, বরং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ধর্মান্তর সাধন।

১০.১ প্রধান এনজিওসমূহের নাম ও কার্যক্রম:

বাংলাদেশে যেসব এনজিও সরাসরি বা পরোক্ষভাবে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমে যুক্ত, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

World Vision Bangladesh – শিশু পুষ্টি, শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নামে প্রচুর তহবিল ব্যয় করে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টধর্মে আনয়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।

CARITAS Bangladesh – একটি ক্যাথলিক মিশনারি সংস্থা, যা সমাজকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রচারে সক্রিয়।

Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB) – শিক্ষাব্যবস্থা, যুব উন্নয়ন, ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের নামে খ্রিস্টান ধর্মীয় মতবাদ ছড়ায়।

Dipshikha, Rainbow House, Life Bangladesh, ActionAid, Swedish Free Mission ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে এবং তাদের কার্যক্রমে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষণীয়।

এছাড়াও প্রায় ৩০,০০০ এনজিও বাংলাদেশে নিবন্ধিত, যার মধ্যে অনেকে সরাসরি মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

১০.২ বিদেশি অর্থায়নের উৎস:

এই এনজিওগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ আসে বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের চার্চ, ধর্মীয় সংস্থা ও দাতা সংস্থার কাছ থেকে। যেমন:

USAID (United States Agency for International Development)

Norwegian Church Aid

Danish Missionary Boards

Christian Aid (UK)

The Lutheran World Federation

অনেক সময় এই অর্থায়ন হয় “মানবিক সহায়তা”, “দুর্যোগকালীন ত্রাণ”, বা “নারী অধিকার রক্ষা” ইত্যাদি শিরোনামে, যাতে জনগণের সন্দেহ না জাগে।

এই অর্থের বড় অংশ খরচ হয় চার্চ নির্মাণ, বাইবেল বিতরণ, ধর্মান্তরিতদের আবাসন, এবং স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণে।

১০.৩ “উন্নয়ন” শব্দের অপব্যবহার:

“উন্নয়ন” শব্দটি মিশনারি সংস্থাগুলো এমনভাবে ব্যবহার করছে যেন তারা একমাত্র ন্যায্য ও নৈতিক কর্তৃত্ব নিয়ে এসেছে দরিদ্রদের সাহায্যে। অথচ বাস্তবে:

এসব উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নির্ভরশীলতা শেখানো হয়, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে।

“উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জনগণকে মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দুর্বল করে তোলা হয়, যা তাদেরকে ধর্মান্তরের দিকে ঠেলে দেয়।

বাস্তব উন্নয়ন কার্যক্রমের চেয়ে ধর্মীয় সভা, বাইবেল ক্লাস, ক্যাম্প প্রোগ্রাম, ও গীর্জা প্রতিষ্ঠায় বেশি অর্থ ব্যয় হয়।

অনেক গবেষক এবং বিশ্লেষক মনে করেন, “উন্নয়ন” এখন মিশনারি কার্যক্রমের এক প্রকার আচ্ছাদন মাত্র—একটি ‘কোড-ওয়ার্ড’, যা দিয়ে তারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করে।

উন্নয়ন একটি উচ্চতর আদর্শ, কিন্তু তা যদি হয় ধর্মান্তরের হাতিয়ার, তবে তা মানবতাবিরোধী ষড়যন্ত্রে রূপ নেয়। বাংলাদেশে বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত অনেক এনজিও সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। এসব সংস্থার কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ করা এখন সময়ের দাবি।

প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য, জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, এবং ইসলামি বিকল্প সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগ।

অধ্যায় ১১: পাহাড়ি অঞ্চলে ধর্মান্তর কর্মকাণ্ড (CHT অঞ্চলের উপর বিশেষ আলোচনা):

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল—যার মধ্যে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা অন্তর্ভুক্ত—একটি বিশেষ ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এলাকা। এখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, ধর্মীয় বৈচিত্র্য, এবং রাষ্ট্রীয় অবহেলার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা দীর্ঘদিন ধরে গোপনে ও প্রকাশ্যে ধর্মান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মুখোশ পরে তারা এ অঞ্চলে ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

১১.১ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে কার্যক্রম

এই তিন জেলাতেই খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপকভাবে চলমান:

বান্দরবান: মিশনারিরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় এখানে। মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সুবিধা, খাদ্য ও আশ্রয়ের বিনিময়ে ধর্মান্তর চালানো হচ্ছে। কিছু এলাকায় গীর্জার সংখ্যা মসজিদের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

রাঙ্গামাটি: খ্রিস্টান মিশনারিদের এনজিওগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা প্রকল্প ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মূলত পাহাড়ি আদিবাসীদের লক্ষ্য করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বহু পরিবার বাইবেল ক্লাস ও ধর্মীয় শিবিরে অংশ নিচ্ছে, যা পরবর্তীতে ধর্মান্তরের দিকে ঠেলে দেয়।

খাগড়াছড়ি: এখানে খ্রিস্টান বিদ্যালয়, বোর্ডিং ও চার্চ স্থাপন করে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ধর্মান্তরের পথ তৈরি করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের নামে বাইবেল শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১১.২ আদিবাসীদের মধ্যে প্রভাব:

সাংস্কৃতিক ক্ষয়: খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ ও অ্যানিমিস্ট (প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক) বিশ্বাসে ধ্বস নেমেছে। নিজেদের ঐতিহ্য, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও আচারবিধিতে পরিবর্তন আসছে।

ধর্মীয় বিভাজন: একই পরিবার বা সম্প্রদায়ের সদস্যরা মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এতে সামাজিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে এবং বিভাজন গভীর হচ্ছে।

নবধর্মান্তরিতদের বিশেষ সুবিধা: গীর্জা ও এনজিও সমর্থিত সংস্থাগুলো তাদের জন্য আবাসন, চাকরি ও বিদেশে স্কলারশিপের সুযোগ করে দেয়, যা অন্যদের জন্য অনুপলভ্য।

১১.৩ সরকার ও সামরিক শক্তির অবস্থান:

সরকারি নিষ্ক্রিয়তা: রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মান্তর রোধে কার্যকর কোনো নীতিমালা নেই। বরং উন্নয়ন সহায়তার নামে অনেক খ্রিস্টান সংস্থা সরকারিভাবে অনুমোদিত এনজিও হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তি: এ চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের মধ্যে এক ধরনের পৃথক স্বীকৃতি তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে কিছু গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের উত্থান ঘটায়। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলে নিজস্ব "খ্রিস্টান বেল্ট" তৈরি করছে।

সামরিক শক্তির ভূমিকা: সেনাবাহিনী কখনো কখনো ধর্মান্তর প্রতিরোধে ভূমিকা রাখলেও, অনেকে অভিযোগ করেছেন যে কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টান এনজিওগুলোর কার্যক্রমকে উপেক্ষা বা পরোক্ষ সহযোগিতা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্পর্শকাতর ও কৌশলগত এলাকা। এখানে ধর্মান্তর কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় নয়, বরং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হয়ে উঠতে পারে। খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব শুধু ধর্মীয় বিভাজনই নয়, বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটও সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত নীতি গ্রহণ ও আদিবাসী জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ইসলামি বিকল্প ব্যবস্থার প্রচলন এখন সময়ের দাবি।

অধ্যায় ১২: আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন:

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এই দুর্বলতাকে পুঁজি করে বিভিন্ন শক্তি — যেমন রাজনৈতিক দল, বহুজাতিক সংস্থা, ধর্মীয় মিশনারি ও ভূমিদস্যুরা — তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে কেন ও কীভাবে এই জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশলে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

১২.১ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা: সহজ লক্ষ্যবস্তু:

আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো সাধারণত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে দিনাতিপাত করে। এই দুর্বল অবস্থানের কারণে তারা বহুমাত্রিক শোষণ ও প্রতারণার সহজ শিকার হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দল, এনজিও, ধর্মীয় মিশনারি বা বাণিজ্যিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য বা চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ব্যবহার করে। যেমন, খ্রিষ্টান মিশনারিরা বহু স্থানে খাদ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা দিয়ে ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা করে থাকে।

১২.২ ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা: প্রতিরোধহীনতা:

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চর্চা থাকে, যা মূলধারার সমাজ থেকে অনেকটাই আলাদা। ফলে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত হয়, এবং তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেক সময় সচেতন থাকে না। এই বিচ্ছিন্নতা তাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস করে। ফলে তারা বহিরাগত শক্তির প্রভাব ও দখলের মুখে পড়ে। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণের জন্য এই সাংস্কৃতিক দূরত্বকে কাজে লাগানো হয়।

১২.৩ ভোটব্যাংক ও রাজনৈতিক স্বার্থ: কৌশলগত ব্যবহার:

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অনেক সময় নির্বাচনী রাজনীতিতে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সময় তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাশে দাঁড়ানোর ভান করে, কিন্তু বাস্তবে তারা সেই জনগোষ্ঠীর মৌলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করে কেবল সাময়িক সুবিধা দেয়। অন্যদিকে, আদিবাসীদের জমি ও সম্পদ দখলের জন্য পরিকল্পিতভাবে তাদের এক জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, যা মূলত বৃহৎ পুঁজিবাদী ও রাজনৈতিক স্বার্থে করা

হয়। অনেক সময় তাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে ‘ভাগ করে শাসন’ নীতিও প্রয়োগ করা হয়।

অধ্যায় ১৩: ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর প্রভাব:

বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজ শুধু আদিবাসী বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা কৌশলে মুসলিম সমাজের ভেতরেও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে। ধর্মান্তরের পাশাপাশি, ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে দুর্বল করা এবং সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া তাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে এ প্রভাবসমূহ পর্যালোচনা করা হলো।

১৩.১ ইসলামী আচার-আচরণে পরিবর্তন:

খ্রিস্টান মিশনারিরা একদিকে যেমন দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ইসলামী জীবনের রীতিনীতি ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

ইসলামী পোশাক ও শালীনতা: মিশনারি নিয়ন্ত্রিত স্কুল, কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইসলামী পর্দা ও শালীন পোশাককে বাধাগ্রস্ত করে আধুনিকতার নামে পশ্চিমা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা: আর্থিক সহায়তা বা শিক্ষা পেতে গিয়ে মুসলিমরা ধর্মীয় দায়িত্বে অবহেলা শুরু করে, নামাজ, রোজা, হালাল-হারামের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলামী উৎসবের অবমূল্যায়ন: ঈদ, রমজান, মিলাদ, মাওলানা ওলামাদের বয়ানকে ‘গোঁড়ামি’ বলে অবহেলা করা হচ্ছে, যার ফলে তরুণ প্রজন্ম ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

১৩.২ মুসলিম তরুণদের লক্ষ্যবস্তু করা:

তরুণ সমাজ যে কোনো পরিবর্তনের প্রধান বাহক। খ্রিস্টান মিশনারিরা এটিকে ভালোভাবেই বুঝেছে এবং তাই তারা মুসলিম তরুণদের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

বৃত্তি ও বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ: কিছু মিশনারি সংগঠন মুসলিম ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও স্কলারশিপের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের আস্তে আস্তে খ্রিস্টধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে।

আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাব: ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, মিশনারি পরিচালিত কলেজে ইসলামবিদ্যা সংকুচিত করে খ্রিস্টীয় মতাদর্শ ঢোকানো হচ্ছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার: খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মিউজিক ভিডিও, এনিমেশন এবং অনলাইন গেমের মাধ্যমে তরুণদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৩.৩ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:

ধর্মান্তর বা সংস্কৃতি পরিবর্তনের প্রভাবে একটি মুসলিম ব্যক্তি বা পরিবার ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

পরিবারে ফাটল: একজন সদস্য ধর্মান্তরিত হলে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। মা-বাবা, ভাই-বোনের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়।

মুসলিম সমাজ থেকে বিতাড়ন: যারা খ্রিস্টান মূল্যবোধে প্রভাবিত হয়ে ধর্মের প্রতি নির্লিপ্ত হয়, তারা ইসলামি সংস্কৃতিমূলক আয়োজন, মসজিদে যাওয়া বা ইসলামী সংগঠনে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

নবধর্মান্তরিতদের বিশেষায়িত আবাসন: মিশনারিরা আলাদা ঘেটো বা ‘কমিউনিটি’ তৈরি করছে যেখানে একবার যারা খ্রিস্টান হয়, তাদের ইসলামী সমাজে ফেরত আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর খ্রিস্টান মিশনারিদের এই প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ। তারা কেবল ধর্ম পরিবর্তন করছে না, বরং মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য ও জীবনব্যবস্থাকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই আগ্রাসনের মোকাবেলায় দরকার সচেতনতা, শিক্ষা, ইসলামী সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ এবং সরকারি নীতিতে কঠোরতা।

অধ্যায় ১৪: মুসলিম সমাজে ধর্মান্তরের চেষ্টার ধারা:

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মান্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করা। যদিও ইসলামের প্রতি এ দেশের মানুষের অগাধ ভালোবাসা রয়েছে, তথাপি সমাজের আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দুর্বলতাকে পুঁজি করে মিশনারিরা মুসলিম সমাজেও ধর্মান্তরের কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। এই অধ্যায়ে সে চেষ্টার মূল ধারা বিশ্লেষণ করা হলো।

১৪.১ আর্থিক লোভ দেখানো:

মিশনারিরা মুসলিম জনগণের দরিদ্রতা ও অভাব-অনটনকে কেন্দ্র করে ধর্মান্তরের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হিসেবে অর্থনৈতিক প্রলোভন ব্যবহার করে।

অর্থ সাহায্য: মুসলিম পরিবারকে মাসিক ভাতা প্রদান, খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ করে তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা হয়।

ঘর নির্মাণ ও জমি প্রদান: বসতবাড়ি বা জমি প্রদান করে দরিদ্র মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়, বিশেষত যাদের নিজস্ব কোনো সহায়-সম্পদ নেই।

ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি: এনজিওর মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ ও অনুদান দিয়ে, পরে সেটিকে ধর্মান্তরের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এভাবে মানুষকে আর্থিকভাবে নির্ভরশীল করে ধর্মান্তরে বাধ্য করা হয়। যদিও এই পদ্ধতি সরাসরি জোরপূর্বক নয়, এটি একটি প্রকার্যিত ‘প্রভাব খাটানো’ যার মাধ্যমে মানুষ পেটের দায়ে ধর্মত্যাগ করে।

১৪.২ বেকার যুবকদের চাকরির প্রলোভন:

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকার যুবকদের সংখ্যা অনেক। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা চাকরির আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে ধর্মান্তরে প্রলুব্ধ করছে।

মিশনারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি: কিছু প্রতিষ্ঠান চাকরির জন্য নীরব শর্ত দেয় যে, চাকরি পেতে হলে খ্রিস্টধর্মে আগ্রহ দেখাতে হবে।

বিদেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি: অনেক সময় খ্রিস্টান এনজিও তরুণদের বিদেশে পাঠানোর সুযোগের প্রলোভন দেখায়, যার পিছনে ধর্মান্তরের উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ ও স্কলারশিপ: যুবকদের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নিতে দেওয়া হয়, যেখানে ধাপে ধাপে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে খ্রিস্টধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলা হয়।

এ ধরনের কর্মসংস্থানের প্রলোভনে পড়ে অনেকে নিজের ধর্মীয় পরিচয় বিসর্জন দেন, যদিও হয়তো অনুশোচনাও থাকে, কিন্তু তখন আর ফিরে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

১৪.৩ ধর্মীয় অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ:

মুসলিম সমাজের একটি অংশে ধর্মীয় জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই ধর্মীয় অজ্ঞতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

কুরআন-হাদীস সম্পর্কে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা: ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা হয়। কখনো কখনো খ্রিস্টান ধর্মকে ইসলামের পরিপূরক হিসেবে তুলে ধরা হয়।

উপহার ও আবেগের ব্যবহার: ধর্মীয় উৎসবে উপহার প্রদান, সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রথমে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে পরে তা ধর্মান্তরে পরিণত করা হয়।

শিক্ষাহীন মুসলমানদের টার্গেট: যারা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, তাদের বুঝতে না পারার দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনা হয়।

এই কৌশলগুলো ব্যবহৃত হয় বিশেষত গ্রামাঞ্চল বা চরম দারিদ্রপীড়িত এলাকায়, যেখানে মানুষের ধর্মচর্চা অনেক সময়ই লোকজ বিশ্বাসের সাথে মিশে যায়, এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অভাব থাকে।

১৪.৪ নারীদের টার্গেটকরণ ও পরিবার-ভিত্তিক কৌশল:

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তর কার্যক্রমে একটি সুপরিকল্পিত ও কৌশলগত লক্ষ্যবস্তু হলো নারী সমাজ। নারীরা যেহেতু পরিবার ও সমাজের ভিত্তিমূল, তাই তাদের প্রভাবিত করলে একটি গোটা পরিবারকেই ধর্মান্তরের পথে নেওয়া সহজ হয়। ফলে মিশনারি গোষ্ঠী নারীদের 'Soft Target' বা সহজলভ্য লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখে থাকে এবং তাদের জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ধর্মান্তরের এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত হয় আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে।

১. দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীদের লক্ষ্যবস্তু করা

মিশনারি সংগঠনগুলো নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, ফ্রি চিকিৎসা, খাদ্য বিতরণ, সন্তানদের জন্য উপহার ও আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করে।

একাধিক NGO নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' নামে প্রকল্প চালিয়ে থাকে, যেগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ও খ্রিস্টান মূল্যবোধ গোপনে সংযুক্ত করা হয়।

অনেক নারীকে বিদেশে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তর করানো হয়।

২. ধর্মীয় অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ

নারীরা প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষায় অনেক সময় পিছিয়ে থাকায় সহজেই প্রভাবিত হয়। এ কারণে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে তাদের বিশ্বাস দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়।

ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকায় খ্রিস্টান মিশনারিরা নারী অধিকারের নামে বিকৃত তথ্য দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায়।

৩. মহিলা ফোকাসড এনজিও ও চার্চ কার্যক্রম

যেমন: World Vision, Caritas, LAMB, এবং Compassion International—এইসব সংস্থা গ্রামের দরিদ্র নারীদের নিয়ে গঠন করে 'মা ও শিশু সেবা দল' বা 'নারী উন্নয়ন গ্রুপ'।

এসব দলের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা ও অর্থসাহায্য দেওয়া হয়, পরে ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

৪. নারীদের ব্যবহার করে পরিবার ধর্মান্তরের কৌশল

একবার যদি একজন নারী খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তবে মিশনারিরা তাকে ব্যবহার করে তার স্বামী, সন্তান, ভাই-বোনদের ওপর প্রভাব ফেলতে চায়।

নারীকে পরিবারে "ধর্মীয় দূত" হিসেবে ব্যবহার করে মিশনারিরা একটি গোটা পরিবারের ধর্মান্তর নিশ্চিত করতে চায়।

৫. নারীদের মাঝে খ্রিস্টান সাংস্কৃতিক চর্চা প্রবেশ করানো

খ্রিস্টান NGO গুলো উৎসবের সময় উপহার ও নতুন পোশাক দেয়, যাতে নারী ও শিশুদের মধ্যে খ্রিস্টান সংস্কৃতি জনপ্রিয় হয় (যেমন: ক্রিসমাস উৎসব, ইস্টার পার্টি)।

মেয়েদের জন্য ইংরেজি ভাষা শেখানো, বিদেশি সাহিত্য ও সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করে তাদের মানসিকভাবে 'ওয়েস্টার্নাইজ' করা হয়।

৬. পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করার অপচেষ্টা

নারীকে স্বামীর অনুগত না হয়ে 'নিজস্ব চিন্তা' ও 'স্বাধীনতা'র নামে ইসলামবিরোধী মানসিকতা দেওয়া হয়।

পরিবারকে ইসলামি আচার-আচরণ থেকে সরিয়ে এনে খ্রিস্টান পারিবারিক সংস্কৃতি যেমন 'পিতার পরিবর্তে পাস্টরের পরামর্শ', 'যিশুর নামেই প্রতিদিন প্রার্থনা' ইত্যাদি চালু করা হয়।

খ্রিস্টান মিশনারিদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নারীদের নির্বাচন একটি কৌশলী পদক্ষেপ। তারা জানে, একজন মা, স্ত্রী বা বোনকে প্রভাবিত করতে পারলে একটি গোটা পরিবার ধর্মান্তরের পথে অগ্রসর হতে পারে। তাই মুসলিম সমাজকে নারীদের ইসলামি শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ইসলাম নারীদের যে সম্মান দিয়েছে,

তা জানানো ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের ধর্মান্তরের প্রলোভন থেকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি নারী কেন্দ্রিক NGO কার্যক্রমের ওপর কড়া নজরদারি রাখা আবশ্যক।

মুসলিম সমাজে ধর্মান্তরের এই চেষ্টাগুলো বহুমুখী ও সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আর্থিক অনটন, কর্মসংস্থানের অভাব এবং ধর্মীয় অজ্ঞতা—এই তিনটি দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের বিশ্বাস পরিবর্তনের অপচেষ্টা একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় দরকার ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার, আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, এবং ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক সামাজিক সংগঠনসমূহের সক্রিয় ভূমিকা।

অধ্যায় ১৫: মিশনারি কার্যক্রম ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা:

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় প্রসারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা প্রভাব, যা ধীরে ধীরে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস এবং এই ধর্মান্তর প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োগ দেশের ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতির পরিবেশকে নষ্ট করছে। নিচে এ প্রসঙ্গে তিনটি উপবিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১৫.১ সামাজিক সহিংসতা ও বিভাজন:

খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের ফলে সমাজে দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি ও সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে, বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে ধর্মান্তরের পর তাদের সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব, ও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান থেকে বিচ্যুতির ফলে বিভেদ বাড়ছে। এসব বিভাজন একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ায়, অন্যদিকে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

১৫.২ কৌশলগত ধর্মান্তর:

মিশনারিরা তাদের কার্যক্রমে সরাসরি ধর্মীয় প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও বাসস্থানের প্রলোভন দিয়ে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এই কৌশলগত ধর্মান্তরকে তারা "সেবা" বা "উন্নয়ন সহযোগিতা" নামে আড়াল করে। গ্রামীণ দরিদ্র, নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক আদিবাসীদেরকে লক্ষ্য করে ধর্মান্তরের মাধ্যমে একটি পরিকল্পিত খ্রিস্টান জনসংখ্যা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। ফলে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভেতরেও এক নতুন বিভক্তি তৈরি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রূপ নিতে পারে।

১৫.৩ সংখ্যালঘু রাজনীতি:

ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে সংখ্যালঘু অধিকার ও নিরাপত্তার কথা বলে ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছু মিশনারি সংস্থা এবং এনজিও এই ধর্মান্তরিতদের সাংগঠনিকভাবে সংগঠিত করে সংখ্যালঘু রাজনীতির অংশ করে তুলছে। আন্তর্জাতিক সহায়তা ও পশ্চিমা দেশগুলোর রাজনৈতিক চাপ ব্যবহার করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টাও চালানো হচ্ছে। এর ফলে, একদিকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও দৃষ্টি-কটুতা তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে বিদেশি হস্তক্ষেপের ঝুঁকিও বাড়ছে।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা একটি দেশের স্থিতিশীলতা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতিগত ঐক্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিকল্পিত ও কৌশলগত ধর্মান্তর কার্যক্রম ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সহনশীলতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ থাকা উচিত, সেটিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এ থেকে উত্তরণে রাষ্ট্রের কঠোর নজরদারি, সচেতন নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ, এবং ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক জাগরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অধ্যায় ১৬: আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার ভূমিকা ও প্রভাব

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি ও ধর্মান্তর প্রচারণার পেছনে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্থাগুলো উন্নয়ন, মানবাধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি আকর্ষণীয় শিরোনামের আড়ালে খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে থাকে। অনেক সময় এদের অনুদান ও প্রকল্পগুলোর ভেতরেই সুপ্তভাবে ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্য থাকে। এই অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর প্রকৃত কার্যকলাপ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে।

১৬.১ ইইউ, ইউএসএআইডি ও বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা:

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), ইউএসএআইডি (USAID) ও বিশ্ব ব্যাংক—এই তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বহু বছর ধরেই বাংলাদেশের তথাকথিত "উন্নয়ন খাতে" অর্থ প্রদান করে আসছে। তবে বাস্তবতা হলো, এই সংস্থাগুলোর অর্থায়ন কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য নয়, বরং সামাজিক রূপান্তরের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়।

ইইউ ও খ্রিস্টীয় সাংস্কৃতিক মানদণ্ড: ইইউ প্রভাবশালী এনজিও ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মাধ্যমে এমন কিছু শর্ত আরোপ করে যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। অনেক ক্ষেত্রে মিশনারি সংগঠনগুলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে সরাসরি তহবিল প্রদান করা হয়।

ইউএসএআইডি-এর রাজনৈতিক প্রভাব: ইউএসএআইডি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রকল্পের আড়ালে ধর্মান্তর ও "নৈতিক সংস্কার"-এর কার্যক্রম পরিচালনায় মদদ দেয়। তারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আধুনিকায়নের নামে পশ্চিমা মূল্যবোধে রূপান্তর করতে চায়।

বিশ্ব ব্যাংকের নীতিনির্ধারণে প্রভাব: বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন করে এবং প্রায়শই পাঠ্যক্রম ও নীতিমালায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও "সামাজিক অন্তর্ভুক্তি"-র নামে খ্রিস্টীয় মানবিকতা প্রবেশ করায়।

এই সংস্থাগুলোর প্রভাবশালী অনুদান বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণেও প্রভাব বিস্তার করে, ফলে অনেক সময় সরকার জনগণের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

১৬.২ 'সুশীল সমাজ' এর ব্যবহৃত মুখোশ:

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো প্রায়শই তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দেশীয় "সুশীল সমাজ" ও এনজিও গুলোর ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সুশীল সমাজের অনেকাংশই ধর্মীয় পক্ষপাত ও বিদেশি আদর্শে অনুপ্রাণিত।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিরোধীতা: অনেক সংগঠন ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে ইসলামী মূল্যবোধকে তুচ্ছ করে, ধর্মীয় অনুশীলনকে পশ্চাদপদতা হিসেবে উপস্থাপন করে।

মানবাধিকারের নামে ধর্মান্তর সহায়ক নীতি: নারী ও শিশুর অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার—এমন ইস্যুতে কাজ করতে গিয়ে সুশীল সমাজের অনেক অংশ খ্রিস্টান এনজিও ও মিশনারিদের মিত্র হিসেবে কাজ করে।

মিডিয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব: আন্তর্জাতিক তহবিলে পরিচালিত গবেষণা বা প্রচারণামূলক প্রবন্ধ-পুস্তক বা প্রতিবেদনগুলোতে ইসলাম বা মুসলিম সমাজের রীতিনীতিকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়।

এই মুখোশধারী সুশীল সমাজ কার্যত একটি ধর্মবিরোধী এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিপুষ্ট শ্রেণি তৈরি করছে, যারা সাধারণ মুসলমানদের মনোজগতে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সহায়ক।

১৬.৩ বৈদেশিক চাপে সরকার:

আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রায়শই বৈদেশিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাপে নতিস্বীকার করে।

নীতিমালায় সমঝোতা: নারী শিক্ষা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ইত্যাদি ইস্যুতে অনেক সময় এমন নীতিমালা গৃহীত হয়, যেগুলো দেশের ধর্মীয় সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী।

ধর্মীয় সংগঠনের কার্যক্রমে বাধা: সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চাপে ইসলামপন্থী সংগঠন বা দাওয়াতী কার্যক্রমের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচার-প্রচারণা নিয়ন্ত্রণে অনীহা দেখায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রভাব: পাঠ্যপুস্তকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামী চিন্তা বাদ দেওয়া, আর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন বাধ্যতামূলক করাও এই চাপে সরকারের করণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধরনের বিদেশি চাপ ও মদদের ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বকীয়তা হুমকির মুখে পড়ছে।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচন বা উন্নয়ন নয়, বরং তারা এক ধরনের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কাজ করছে। এই সংস্থাগুলোর অর্থায়ন, প্রভাব ও রাজনৈতিক চাপ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই প্রয়োজন সচেতনতা, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ও নীতিনির্ধারকদের দায়িত্বশীলতা।

অধ্যায় ১৭: খ্রিস্টান বানানোর কৌশল

খ্রিস্টান মিশনারিরা মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এসব কৌশল সাধারণত চতুর, কৌশলী ও বিভ্রান্তিকর পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। নিচে তাদের কিছু প্রচলিত কৌশল তুলে ধরা হলো:

১৭.১ দান ও দয়ালু কার্যকলাপের মাধ্যমে মন জয় করা:

খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাদের কার্যক্রমের প্রথম ধাপ হিসেবে মানবিক সহানুভূতির মোড়কে নিজেদের উপস্থাপন করে। তারা দরিদ্র, রোগাক্রান্ত, যুদ্ধপীড়িত বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ায়। এসব সহায়তা সাধারণত নিম্নরূপ হয়:

খাদ্য, কাপড়, ওষুধ, শিশুদের জন্য দুধ ও খেলনা বিতরণ;

বিধবা ও এতিমদের জন্য ভাতা বা মাসিক সহায়তা;

বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি মেরামত করে দেওয়া;

দুর্গম অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এইসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষের মনে জায়গা করে নেয় এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। অনেক সময় এই দানসেবার সাথে গোপনে বা খোলাখুলিভাবে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়—"এই সহায়তা পেতে হলে বাইবেল পড়তে হবে", "প্রার্থনাতে অংশ নিতে হবে", কিংবা "গীর্জায় যেতে হবে"।

এভাবে একপর্যায়ে সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিটি বুঝতেই পারে না, কখন সে নিজের বিশ্বাস হারিয়ে অন্য ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। এ কৌশল বিশেষ করে দরিদ্র ও নিরুপায় মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়।

১৭.২ দারিদ্র্য ও দুর্যোগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার:

মিশনারিরা বুঝে গেছে, দারিদ্র্য মানুষের মর্যাদা ও চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ঈমান ও ধর্মের গুরুত্ব অনেক সময় ম্লান হয়ে যায়, যদি তার সন্তানের খাবার না থাকে। এই মানবিক দুর্বলতাকে পুঁজি করে তারা তাদের পরিকল্পনা সাজায়।

যখনই কোনো এলাকা দুর্যোগে পড়ে—যেমন:

বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়;

ভূমিকম্প;

মহামারী বা মহামারী-সদৃশ পরিস্থিতি;

সামাজিক অস্থিরতা বা যুদ্ধের সময়—

তখন মিশনারি দল দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায় এবং সাহায্যের নামে তাদের ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে। মুসলিম কিংবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী দরিদ্র পরিবার যারা একবেলা খাবার পায় না, তারা যখন দেখে কিছু লোক বিনামূল্যে চাল, ডাল, ত্রাণসামগ্রী দিচ্ছে—তখন তারা কোনো প্রশ্ন না করেই তা গ্রহণ করে।

এই দুর্বল পরিস্থিতিকে তারা "সুবর্ণ সুযোগ" হিসেবে দেখে এবং পরবর্তীতে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে ধর্মান্তরের জন্য সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করে।

১৭.৩ ইসলামী জ্ঞানের অভাবকে কাজে লাগানো:

অনেক মুসলমান শুধুমাত্র নামাজ-রোজার মুসলমান। তারা কুরআনের অর্থ বোঝে না, হাদীস জানে না, ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সীমিত বা বিকৃত। এই সুযোগটিকে মিশনারিরা চরমভাবে কাজে লাগায়।

তারা ইসলামের কিছু আয়াত বা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে প্রশ্ন তোলে। যেমন:

"তোমার কুরআনেই তো লেখা আছে, খ্রিষ্টানরা বন্ধু হতে পারে।" (সুরা আল-মায়িদা ৫:৫৪-এর ভুল ব্যাখ্যা করে)

"তোমাদের নবী নাকি তলোয়ার দিয়ে ধর্ম প্রচার করতেন, আর যীশু তো ভালোবাসার কথা বলেন!"

"তোমাদের ধর্ম তো মেয়েদের অবদমন করে, খ্রিষ্টধর্মে নারী পূজিত।"

এভাবে প্রশ্ন করে সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করা হয়। যদি সে সঠিক জবাব না দিতে পারে, তবে সে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পড়ে এবং তখন তাকে ধীরে ধীরে বাইবেল পড়তে, প্রার্থনায় অংশ নিতে ও খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়।

এ ক্ষেত্রে মিশনারিরা সুশিক্ষিত ও কৌশলী বক্তা নিয়োগ করে, যারা দার্শনিক যুক্তি এবং মনস্তত্ত্ব ব্যবহার করে মুসলিম তরুণদের ঈমান দুর্বল করে।

অধ্যায় ১৮: যে অঞ্চলে অপতৎপরতা বেশি

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে অপতৎপরতা বেশি দেখা যায়। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তির জন্য সামান্য কিছু টাকার কারণে নিজের ধর্ম ত্যাগ করছে। দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাও জেলায় দেখা যায়। এছাড়াও কুড়িগ্রাম, নাওগা, লালমনিরহাট পাহাড়ি অঞ্চলে অপতৎপরতা দেখা যায়।

১৮.১. দিনাজপুর জেলা

অবস্থান ও প্রেক্ষাপট:

দিনাজপুর বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি জেলা, যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায় (সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি) বসবাস করে।

মিশনারিদের অপতৎপরতা:

বিদেশি ও দেশীয় মিশনারিরা এখানে অনেক বছর ধরে সক্রিয়।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার নামে ব্যাপক ধর্মান্তরণ কার্যক্রম চালানো হয়।

দিনাজপুরের পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী ও নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিশেষভাবে সক্রিয়।

আদিবাসীদের মাঝে বাইবেল বিতরণ, ছোটদের Sunday School চালানো হয়।

কিছু আদিবাসী গ্রামে 'খ্রিস্টান পল্লী' গড়ে উঠেছে।

১৮.২. পঞ্চগড় জেলা

অবস্থান ও প্রেক্ষাপট:
পঞ্চগড় বাংলাদেশের সর্বউত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা, যেখানে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশি।

মিশনারিদের অপতৎপরতা:

ভারত সীমান্তবর্তী হওয়ায় ভারতীয় মিশনারিদের প্রভাব রয়েছে।

বোদা, দেবীগঞ্জ ও তেতুলিয়া উপজেলায় এনজিও-র মাধ্যমে মিশনারি কাজ চলছে।

দরিদ্র মুসলিম পরিবারকেও অর্থ ও সাহায্যের প্রলোভনে টার্গেট করা হচ্ছে।

কিছু এলাকায় গোপনে ধর্মান্তরিতদের জন্য উপাসনালয় স্থাপন করা হয়েছে।

খ্রিস্টান এনজিওদের 'গৃহ নির্মাণ প্রকল্প' ধর্মান্তরিতদের জন্য চালু।

১৮.৩. ঠাকুরগাঁও জেলা

অবস্থান ও প্রেক্ষাপট:
ঠাকুরগাঁওও একটি সীমান্তবর্তী জেলা, যেখানে আদিবাসী ও দলিত শ্রেণির লোকজনের বসবাস রয়েছে।

মিশনারিদের অপতৎপরতা:

রাণীশংকৈল, পীরগঞ্জ ও বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় খ্রিস্টান মিশনারিদের উপস্থিতি দৃশ্যমান।

খ্রিস্টান পরিচালিত এনজিও 'উন্নয়ন প্রকল্প' এর আড়ালে ধর্মান্তরণের কাজ করে যাচ্ছে।

মুসলিম সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে।

কিছু মিশনারি স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রভাব বিস্তার করে।

অধ্যায় ১৯: বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ও পদক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি ধর্মপ্রাণ মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বহুপক্ষীয় চাপে সরকার অনেক সময় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াবলিতে দ্ব্যর্থতা প্রকাশ করে থাকে। একদিকে সরকার সংবিধানে ধর্মীয় অধিকার ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অন্যদিকে বৈদেশিক অনুদান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চাপে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রমকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। এই অধ্যায়ে সংবিধান, এনজিও নীতিমালা এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারির প্রসঙ্গ নিয়ে সরকারের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করা হলো।

১৯.১ সংবিধানে ধর্মীয় অধিকার:

বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণা: সংবিধানের ৪১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—"প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার থাকবে।" এই অনুচ্ছেদ ধর্মীয় স্বাধীনতা

নিশ্চিত করলেও, এর সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা ধর্মান্তরের প্রচারণায় নিরবচ্ছিন্নভাবে লিপ্ত হতে পারছে।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম: ১৯৮৮ সালে সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা এখনো বলবৎ আছে। তবে বাস্তবিক কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী মূল্যবোধকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার চেয়ে অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষতার নামে পশ্চিমা আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ধর্মীয় সাম্য নাকি ধর্মীয় সমতা?: সরকার 'ধর্মীয় সাম্য' প্রদানের নামে অনেক সময় ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে নীরব থাকে, যা এক ধরনের পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত দেয়। এই দ্বৈতনীতি মুসলিম জনগণের মাঝে সন্দেহ ও ক্ষোভের জন্ম দেয়।

১৯.২ এনজিও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা:

বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম তদারকির জন্য বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো: ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরো' (NGO Affairs Bureau) বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিওদের কার্যক্রম নিবন্ধন, অনুমোদন ও তদারকির দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু বাস্তবে এটি অনেক সময় প্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়।

নীতিমালার দুর্বল প্রয়োগ: অনেক মিশনারি সংস্থা নিজেদের কার্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবার আড়ালে পরিচালনা করে, যা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নজরদারির বাইরে থেকে যায়। কিছু সংস্থা প্রকল্পের নামে ধর্মান্তর, মিশনারি প্রশিক্ষণ ও গোপন ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত থাকে।

বিদেশি চাপ ও সুবিধাভোগী আমলাতন্ত্র: বিদেশি সাহায্যের নির্ভরতায় সরকার অনেক সময় এনজিওদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে পারে না। পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও অনৈতিক সহযোগিতা মিশনারিদের কাজকে সহজ করে দেয়।

১৯.৩ রাষ্ট্রীয় নজরদারি:

সরকারের তরফ থেকে মাঝে মাঝে কিছু নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও, তা দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর নয়।

বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট: বিভিন্ন সময়ে দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো কিছু খ্রিস্টান মিশনারি এনজিওর বিরুদ্ধে ধর্মান্তরের প্রমাণসহ রিপোর্ট পেশ করেছে। যেমন, ১৯৯৯ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে সান্তাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তর প্রমাণ করেছে।

সীমিত কার্যক্রম: যদিও সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী মাঝে মাঝে অভিযানে যায় বা তদন্ত করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি মদদে পরিচালিত এনজিওদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

সীমান্তবর্তী এলাকায় দুর্বল উপস্থিতি: বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো এলাকাগুলোতে রাষ্ট্রীয় তদারকি অত্যন্ত দুর্বল, যার সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলী কার্যক্রম চালিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের নীতিগত অবস্থান ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রক্ষার পক্ষে হলেও, বাস্তবে সরকারের পদক্ষেপ অনেক সময় দ্ব্যর্থতাপূর্ণ ও নমনীয়। সংবিধান ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় মিশনারিরা সুযোগ গ্রহণ করছে। তাই প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং ধর্মীয় সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

অধ্যায় ২০: উপসংহার

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় বরং এটি একটি সুদূরপ্রসারী, সংগঠিত ও চতুর পরিকল্পনার অংশ, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মান্তরের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ইউরোপে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ, উপনিবেশবাদ, ও আধুনিক উন্নয়ন ধারণার আড়ালে শুরু হওয়া মিশনারি আন্দোলন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই দেশে তারা দরিদ্র, প্রান্তিক, ধর্মীয়ভাবে দুর্বল ও শিক্ষাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নারী উন্নয়নের মতো মানবিক মুখোশ পরে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চল, আদিবাসী সমাজ, নারী ও শিশু, বেকার যুবক এবং ধর্মীয় অজ্ঞ জনগণ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগিতা, এনজিও কর্মকাণ্ড ও বিদেশি সাহায্যের আড়ালে ধর্মান্তর কর্মকাণ্ড, আদিবাসী সংস্কৃতির বিলুপ্তি এবং ইসলামী সংস্কৃতির ওপর আঘাত একটি গভীর জাতীয় সংকট তৈরি করেছে। শুধু ব্যক্তি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, বরং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদেরও এ বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রাখা এখন সময়ের দাবি।

তবে এই বিপদের মোকাবেলায় কেবল অভিযোগ বা প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সংগঠিত সচেতনতা, পরিকল্পিত দাওয়াতি কার্যক্রম, ইসলামি শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, তথ্যভিত্তিক প্রচারণা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আইনানুগ প্রতিরোধ। পরিবার, সমাজ, আলেম সমাজ, ইসলামি সংগঠন, মিডিয়া এবং সরকার—সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আজ যদি আমরা চুপ করে থাকি, উদাসীন থাকি, তবে আগামী প্রজন্মের ঈমান, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অতি প্রবল। তাই এখনই সময় নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের। আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল রেখে, সাহসিকতা ও হিকমাতের সঙ্গে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। নইলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।